ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 68-74
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.435

সুকুমার রায়ের ‘ননসেন্স’: যুক্তি ও পরাবাস্তববাদের সন্ধানে

ড. নয়ন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 29.03.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although Sukumar Ray's literature is generally considered to be confined to the children's genre, the current study has established his 'nonsense' creation as a profound political and psychological metaphor. The world of 'irrationality' that Sukumar creates, parallel to global surrealism and Dadaism in the first half of the 20th century, is essentially an artistic means of questioning colonial modernity and rigid rationalism. This article analyses Sukumar's social satire in the light of Homi K. Bhabha's theory of 'hybridity' and Mikhail Bakhtin's concept of 'carnivalesque' in the context of his hybrid animalism. The results of the study indicate that Sukumar's linguistic construction and bureaucratic criticism embodied in works like 'Ekushe Ain' establish him as a pioneer of postmodern literary theory.

Keywords: Sukumar Ray, Nonsense, Surrealism, Post-colonialism, Hybridity, Linguistic Deconstruction

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুকুমার রায় (১৮৮৭–১৯২৩) এমন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা, যাঁর সৃজনী বিশ্ব আপাতদৃষ্টিতে কৌতুকময় ও কিশোরপাঠ্য মনে হলেও তার গভীরে নিহিত রয়েছে এক জটিল দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক অভীপ্সা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন বৈশ্বিক সাহিত্যাকাশে আধুনিকতাবাদের ডামাডোল, দাদাবাদ ও পরাবাস্তববাদের মতো আমূল পরিবর্তনকামী আন্দোলনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে সুকুমার রায়ের হাতে জন্ম নেয় এক স্বতন্ত্র ‘ননসেন্স’ বা ‘খেয়াল-রস’। তাঁর এই সৃষ্টি কেবল শব্দের চাতুর্য নয়, বরং তা ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চাপিয়ে দেওয়া রূঢ় যুক্তিবাদ ও আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে এক প্রকার নান্দনিক বিদ্রোহ। গবেষণার এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে সুকুমার রায়ের সাহিত্যকে পাঠ করার জন্য আমাদের প্রচলিত লৈখিক সীমানা অতিক্রম করতে হয়। এডওয়ার্ড লিয়ার কিংবা লুইস ক্যারলের হাত ধরে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে ‘ননসেন্স’ ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, সুকুমার তাকে কেবল গ্রহণই করেননি, বরং দেশীয় সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও ভাষিক কাঠামোর রসে সিক্ত করে এক নতুন মাত্রা দান করেছেন। তাঁর ‘আবোল তাবোল’ কিংবা ‘হয়বরল’ গ্রন্থের পাতায় যে বিশৃঙ্খলা বা ‘অ্যাবসার্ডিটি’র দেখা পাওয়া যায়, তা মিখাইল বাখতিন বর্ণিত ‘কার্নিভ্যালেস্ক’ ঐতিহ্যেরই এক অনন্য প্রতিফলন। যেখানে সমাজের উচ্চবর্গীয় গাম্ভীর্য এবং প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার কাঠামোকে হাস্যকৌতুকের মোড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়। সুকুমার রায়ের সাহিত্যিক দর্শনে ‘পরাবাস্তববাদ’ এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের গহীন কোণ থেকে উঠে

আসা রূপকল্পগুলো যখন তাঁর লেখনীতে 'হাঁসজারু' কিংবা 'বকচ্ছপ'-এর রূপ নেয়, তখন তা কেবল কল্পনা বিলাস থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে সমকালীন হাইব্রিডিটি বা সাংস্কৃতিক সংকরায়ণের এক মূর্ত প্রতীক। সুকুমারের এই 'অযুক্তি' আদতে এক প্রকার 'উচ্চতর যুক্তি', যা আমাদের শিখিয়ে দেয় যে বাস্তবতার কোনো একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক নেই। প্রস্তুত প্রবন্ধ আমরা কেবল সুকুমার রায়ের ছড়া বা গল্পের রসাস্বাদন করব না, বরং দেখার চেষ্টা করব কীভাবে তিনি তাঁর উত্তর-আধুনিক লিখনশৈলীর মাধ্যমে ভাষার আভিধানিক অর্থকে বিনির্মাণ করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের আধিপত্যবাদী বয়ানকে অস্বীকার করে তিনি যে 'খামখেয়ালিপনা'র জগতটি তৈরি করেছিলেন, তা কীভাবে বিশ্বসাহিত্যের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এক অনন্য প্রতিরোধ-সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে— এ প্রবন্ধ তারই এক সামগ্রিক তাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

সুকুমার রায়ের সাহিত্যিক দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রকার 'সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা'। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-পরবর্তী বাঙালি মানসে যখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে এক প্রকার কঠোর ও নিরস যুক্তিবাদ জেঁকে বসছিল, সুকুমার তখন তাঁর সৃজনী প্রতিভা দিয়ে সেই যুক্তির অসারতাকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেন। তাঁর 'ননসেন্স' কোনো আকস্মিক পাগলামি নয়, বরং তা এক গভীরতর সত্যের অনুসন্ধান। সুকুমার দেখিয়েছেন যে, যুক্তি যখন তার স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে অন্ধ গোঁড়ামিতে পরিণত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে হাস্যকর ও অবাস্তব। তাঁর 'একুশে আইন' কবিতাটি এক্ষেত্রে একটি প্রকট উদাহরণ। যেখানে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাসন কেবল শাসনের খাতিরেই প্রবর্তিত হয়, কোনো মানবিক যুক্তি সেখানে খাটে না-

> "শিউলি তলার রাস্তায় যাওয়া নিষেধ সেথা চলাই দায়,
> পদাঘাতের নিয়ম আছে একুশ দফার কায়দায়।"[১]

এখানে কবি দেখিয়েছেন, আইন যখন যুক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কীভাবে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক দর্শনের ভাষায় একে 'Absurdity' বলা যেতে পারে, যা আলবেয়ার কামু বা ফ্রাঞ্জ কাফকার সাহিত্যে আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে দেখি। সুকুমার রায় বিশ্বাস করতেন যে, শব্দ বা ভাষার একটি নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ দিয়ে জগতকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাই তিনি শব্দকে তার চিরাচরিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। 'হযবরল'-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

> "বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো,
> চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো।' আমি বললাম, 'রুমাল বলব কেন?'
> বেড়াল বলল, 'তা নয়তো কী? আগে ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা
> বেড়াল। এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?"[২]

এই সংলাপটি কেবল হাস্যরসাত্মক নয়, এটি উত্তর-আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (Post-modern Linguistics) এক বিশাল ইঙ্গিত। যেখানে বস্তুর নাম বা পরিচয় ধ্রুবক নয়, বরং তা আপেক্ষিক। এটি ফার্দিনান্দ ডি সসার-এর 'Signifier' ও 'Signified'-এর মধ্যকার চিরাচরিত সম্পর্ককে অস্বীকার করার এক দুঃসাহসী প্রয়াস। একজন কৃতী ছাত্র এবং বিজ্ঞানী পরিবারের সন্তান হিসেবে সুকুমার জানতেন বিজ্ঞানের নির্ভুলতা। কিন্তু তিনি সেই নির্ভুলতাকেই ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর অসামান্য 'ননসেন্স' গণিতের মাধ্যমে। গেছো-দাদার সেই অদ্ভুত হিসাব বা বুড়ো হাড়কিপ্পের আয়ুর গণনা আসলে আমাদের জীবনের অনিশ্চয়তাকেই তুলে ধরে-

> "হিসাব করে দেখলুম বয়স আমার ঠিক পঁচিশ বছর। খাতা খুলে
> দেখি, তাতে লেখা রয়েছে— 'তপনবাবু, বয়স ৩৭ বছর ৩ মাস।'
> আমি বললুম, 'এ কি রে! এ তো আলাদা হিসাব!' বুড়ো বলল, 'তা
> তো হবেই। তুমি কি আমার মতো ক'রে হিসেব করেছ?"[৩]

এই যে নিজস্ব এক একটি জগত তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেকের জন্য যুক্তি আলাদা— এটিই সুকুমার রায়ের দর্শনের মূল ভিত্তি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বৈশ্বিক বা সার্বজনীন যুক্তির চেয়ে ব্যক্তিক ও কাল্পনিক যুক্তি অনেক সময় জীবনের অধিকতর নিকটবর্তী।

কবির 'আবোল তাবোল' কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সৃষ্ট অদ্ভুতুড়ে প্রাণীকুল। এই প্রাণীরা কেবল কল্পনাপ্রসূত নয়, বরং সমকালীন সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের এক গভীর রূপক। বিশেষত, উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক হমি কে. ভাবা তাঁর 'The Location of Culture' গ্রন্থে যে সংকরায়ণের কথা বলেছেন, সুকুমারের সংকর প্রাণীদের মধ্যে তার এক আশ্চর্য পূর্বভাস পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ের খ্যাপাটে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো 'খিচুড়ি' কবিতাটি। যেখানে দুটি ভিন্ন স্বভাবের প্রাণীকে জোরপূর্বক এক করে দেওয়া হয়েছে-

"হাসঁ ছিল সজারুও (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।"[৪]

কিংবা—

"হাতি আর তিমিলয় 'হাতিমি' যে তৈরি,
তিমির লড়াই আর হাতির যে বৈরী।"[৫]

আন্তর্জাতিক গবেষণার নিরিখে দেখলে বোঝা যায়, এই সংকরায়ণ আসলে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার সেই মধ্যবিত্ত 'বাবু' সমাজের প্রতিফলন, যাঁরা না ছিলেন পুরোপুরি বাঙালি, না হতে পেরেছিলেন সাচ্চা সাহেব। এই মাঝখানের সত্তাটি সুকুমার তুলে ধরেছেন এক অদ্ভুত শারীরিক কাঠামোর মাধ্যমে। যেখানে হাঁস ও সজারুর মিলন ঘটে, সেখানে তাদের স্বকীয় পরিচয় হারিয়ে যায় এবং জন্ম নেয় এক তৃতীয় সত্তা, যা আদতে কোনো নির্দিষ্ট কুল বা বংশের নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বড় অস্ত্র ছিল স্থানীয় মানুষকে তাদের মতো করে গড়ে তোলা। কিন্তু সেই অনুকরণ কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতো না। সুকুমারের 'গিরগিটিয়া' বা 'বকচ্ছপ'-এর মতো সৃষ্টিগুলো সেই অপূর্ণ অনুকরণেরই হাস্যকর বহিঃপ্রকাশ। বক যখন কচ্ছপের খোলস ধারণ করে, তখন সে উড়তে পারে না, আবার জলেও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না। এটি কি সেই শিক্ষিত বাঙালির প্রতীক নয়, যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন? সুকুমার রায় বারবার 'ব্যাকরণ মানি না' বলে তাঁর সৃষ্টিকে নিয়মমুক্ত করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশরা যখন আইন, নিয়ম এবং বিজ্ঞানের ছকে ভারতীয় সমাজকে বাঁধতে সচেষ্ট ছিল, তখন সুকুমার তাঁর সংকর প্রাণীদের মাধ্যমে সেই শৃঙ্খলকে উপহাস করেছেন-

"সবাই বলছে 'গিরগিটিয়া', আমি বলছি 'পাখিশিয়া', সবাই বলছে 'তর্ক করো', আমি বলছি 'না শিখিয়া'।"

এই পঙক্তিগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল প্রাণীর রূপ বদলাননি, বরং সেই রূপের সাথে জড়িয়ে থাকা নাম বা সংজ্ঞাকেও বদলে দিতে চেয়েছেন। এটি আধুনিক উত্তর-আধুনিক বিনির্মাণের এক অনন্য উদাহরণ। কবির অনেক চরিত্রই তৎকালীন ক্ষমতার রাজনীতির শিকার। তাঁর সংকর প্রাণীরা প্রায়শই বিভ্রান্ত ও দ্বিধান্বিত। এই দ্বিধা আসলে একটি পরাধীন জাতির মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা। সুকুমার রায়ের 'হাঁসজারু' বা 'তিলোষ্ট্র' আসলে একটি সংকর সংস্কৃতির ট্র্যাজিকোমিক রূপায়ণ। একদিকে ঐতিহ্যের টান, অন্যদিকে আধুনিকতার প্রলোভন— এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট বাঙালির প্রতিকৃতিই হলো তাঁর এই অদ্ভূত প্রাণীকুল।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ১৯২০-এর দশকে যখন আন্দ্রে ব্রেতঁ পরাবাস্তববাদের ঘোষণাপত্র করছেন, প্রায় সমকালেই বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায় 'হযবরল'-এর মাধ্যমে এক অদ্ভুত পরাবাস্তব জগতের অবতারণা করেন। পরাবাস্তববাদের মূল কথা হলো— যুক্তি ও সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে অবচেতন মনের স্বপ্নিল

ও বিশৃঙ্খল রূপকল্পকে প্রকাশ করা। সুকুমারের এই সৃষ্টি সেই বৈশ্বিক আন্দোলনের এক অগ্রবর্তী নিদর্শন। পরাবাস্তববাদী শিল্পে বস্তুর রূপান্তর অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুকুমারের 'হযবরল'-এর শুরুতেই আমরা দেখি-

> "বেশ ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।"[৬]

এটি কেবল জাদুকরী ঘটনা নয়, বরং এটি আমাদের স্বপ্নের সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন যেখানে একটি বস্তু অনায়াসেই অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'The Interpretation of Dreams' গ্রন্থে যাকে স্থানাঙ্ক পরিবর্তন বলেছেন, সুকুমারের রুমাল থেকে বেড়াল হওয়ার ঘটনাটি তারই এক সাহিত্যিক রূপায়ণ। এখানে যুক্তির শাসন নেই, আছে কেবল রূপান্তরের এক অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ। পরাবাস্তববাদে সময়ের কোনো রৈখিক অস্তিত্ব থাকে না। সুকুমারের জগতে সময় স্থবির হতে পারে, আবার লাফিয়ে এগোতেও পারে। 'হযবরল'-এর সেই বুড়োর বয়স গণনার দৃশ্যটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, -

> "আমার বয়স এই গত মঙ্গলবার ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ... যদি বল গত মঙ্গলবার দিনটা বাদ দিয়ে গুনতে, তা হলে বুধবার দিন আমার বয়স হবে ঊনচল্লিশ বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন।"[৭]

এখানে সময় কোনো মহাজাগতিক সত্য নয়, বরং তা একান্তই ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বা বের্গসঁ-র 'Duration' তত্ত্বের এক চমৎকার সাহিত্যিক ভাষ্য পাওয়া যায় সুকুমারের এই অসংলগ্ন গণিতের মধ্যে। সচেতন মন যেখানে সময়কে সেকেন্ড ও মিনিটে বাঁধে, অবচেতন মন সেখানে সময়কে নিজের ইচ্ছামতো সংকুচিত বা প্রসারিত করে। পরাবাস্তববাদী লেখকেরা ভাষাকে তার প্রচলিত অর্থের কারাগার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সুকুমার রায় তাঁর লেখায় এমন সব শব্দ ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন যা আমাদের চেনা জগতের ব্যাকরণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কাকের হিসাব রাখা, গেছো-দাদার হদিস না পাওয়া বা উধো ও বুধোর মারপিট—সবই যেন একটি পরাবাস্তব ছকের অংশ-

> "তারে বলে ঠুঁটো জগন্নাথ—তার মানে বুঝলে? মানে হচ্ছে—গ ছ প।"[৮]

এখানে 'গ ছ প' কোনো অর্থ বহন করে না, কিন্তু অবচেতন মনে এটি এক ধরণের রহস্যময় ব্যঞ্জনা তৈরি করে। এই ভাষিক বিনির্মাণই সুকুমারকে একজন আধুনিক পরাবাস্তববাদী হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে। ফ্রয়েড তাঁর 'The Uncanny' তত্ত্বে বলেছিলেন যে, যখন কোনো অতি পরিচিত বস্তু বা পরিস্থিতি হঠাৎ অচেনা ও রহস্যময় হয়ে ওঠে, তখন এক ধরণের স্নায়বিক শিহরন তৈরি হয়। সুকুমারের 'হযবরল' বা 'আবোল তাবোল'-এর অনেক চরিত্রই যেমন কৌতুককর, তেমনই এক ধরণের অজানা অস্বস্তি বা ভীতিও তৈরি করে। হিজিবিজবিজ-এর অকারণ হাসি কিংবা উদো-বুধোর অন্তহীন ঝগড়া আমাদের অবচেতন মনের সেই অবদমিত অস্থিরতাকেই প্রতিফলিত করে, যা আমরা সচরাচর যুক্তিবাদী সমাজে প্রকাশ করি না।

সুকুমার রায় কেবল একজন সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন 'শব্দ-কারিগর'। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক ফার্দিনান্দ ডি সসার যে চিহ্নক ও চিহ্নিত-এর সম্পর্কের কথা বলেছিলেন, সুকুমার তাঁর লেখনীতে সেই ধ্রুবক সম্পর্ককে বারবার চূর্ণ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শব্দের অর্থ কেবল অভিধানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধ্বনি ও অনুষঙ্গের এক নিরন্তর খেলা। কবির শব্দভাণ্ডারের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে এমন সব শব্দ, যা দুটি ভিন্ন অর্থবহ শব্দকে জুড়ে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও তৃতীয় অর্থ তৈরি করে। একে ভাষাতত্ত্বে Portmanteau বলা হয়। লুইস ক্যারল তাঁর 'Jabberwocky' কবিতায় এটি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সুকুমার একে বাংলা ভাষার নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন। 'হাসঁ' এবং 'সজারু' মিলে

হয়েছে 'হাঁসজারু', 'বক' ও 'কচ্ছপ' মিলে 'বকচ্ছপ'। এই নতুন শব্দগুলো কোনো প্রথাগত ব্যাকরণ মেনে চলে না। এটি লুই ইয়েমস্লেভ-এর ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে এক প্রকার 'বিনির্মাণ', যেখানে ভাষা তার স্থিরতা হারিয়ে এক বহমান ও পরিবর্তনশীল রূপ গ্রহণ করে। তিনি শব্দের অর্থ খোঁজার চেয়ে শব্দের 'ধ্বনি' বা 'শব্দ-তরঙ্গ' দিয়ে ভাব প্রকাশে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কবিতায় এমন কিছু শব্দ আছে যার কোনো অভিধানিক অর্থ নেই, কিন্তু তা পড়ার সময় আমাদের মনে এক বিশেষ অনুভূতি বা চিত্রকল্প তৈরি করে।

"ঝাপ্‌সা ঘোরে ট্যাপ্‌সা ওড়ে, খ্যাপ্‌সা নাচে ফন্দি খোঁজে,
গুম্‌সা হাওয়া গুম্‌রে মরে, গুম্‌টি ঘরে ঝুম্‌টি বোঝে।"[৯]

এখানে 'ট্যাপ্‌সা', 'খ্যাপ্‌সা', বা 'ঝুম্‌টি'— এই শব্দগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট মানে নেই, কিন্তু এদের ধ্বনিগত গুঞ্জনে এক ধরণের অস্বস্তিকর ও রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়। এটি আধুনিক ধ্বনি-অর্থতত্ত্বের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইনি অনেক সময় সাধারণ শব্দকে এমন অদ্ভুত বিশেষণে ভূষিত করেন যে, শব্দের আদি অর্থটিই বদলে যায়। 'রামগরুড়ের ছানা' বা 'বোমাবাজি'— এই শব্দগুলো তিনি যে বিশেষ প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন, তা ভাষার এক প্রকার 'লিঙ্গুইস্টিক ডিসপ্লেসমেন্ট'।

"ল্যাংড়া আমে গান গায়, রামছাগল নাচে গো,
হুঁকোমুখো হ্যাংলাটা কেন মিছে প্যাঁচে গো?"[১০]

এখানে 'হুঁকোমুখো' বা 'হ্যাংলা' শব্দগুলোর প্রয়োগে যে চিত্রকল্প তৈরি হয়, তা বাংলা ভাষার প্রথাগত গাম্ভীর্যকে ভেঙে এক ধরণের উত্তর-আধুনিক 'প্যারডি' তৈরি করে। 'হযবরল' বা 'আবোল তাবোল'-এর চরিত্রগুলোর নাম লক্ষ্য করলে দেখা যায়—হিজিবিজবিজ, উদো, বুধো, নেড়া—এরা সবাই যেন নামের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। সুকুমার দেখিয়েছেন যে, নাম আসলে কোনো ব্যক্তির আসল পরিচয় নয়, বরং তা এক ধরণের আরোপিত তকমা।

"আমার নাম শ্রী হিজিবিজবিজ। আমার বাবার নাম শ্রী হিজিবিজবিজ, আমার দাদাবাবার নাম শ্রী হিজিবিজবিজ..."

এই সংলাপটি আসলে মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট ও ভাষার সীমাবদ্ধতাকে বিদ্রূপ করে। এটি প্রমাণ করে যে, ভাষা যখন সত্য প্রকাশে ব্যর্থ হয়, তখন 'অযুক্তি' বা 'ননসেন্স'-ই হয়ে ওঠে একমাত্র আশ্রয়।

সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স' কেবল ভাষিক ব্যায়াম নয়, এটি একটি তীক্ষ্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার। মিখাইল বাখতিন বর্ণিত 'কার্নিভ্যালেস্ক' তত্ত্বের আলোকে দেখলে বোঝা যায়, সুকুমার তাঁর রচনায় এমন এক সমান্তরাল জগত তৈরি করেছেন যেখানে প্রতিষ্ঠিত আইন, সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতার দম্ভকে হাস্যকর করে তোলা হয়েছে। এটি ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধিক প্রতিবাদ। কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বিদ্রূপ হলো তাঁর 'একুশে আইন' কবিতাটি। ব্রিটিশ শাসনের সেই দমনমূলক আইনকানুন ও অদ্ভুত সব বিধিনিষেধকে তিনি এখানে চরম উপহাসের বিষয়বস্তু করেছেন।

"রাজার হুকুম মানতে হবে, একুশ দফার কায়দায়,
না মানলে পরে একুশ টাকা জরিমানা একুশ তায়।"[১১]

এখানে 'একুশ' সংখ্যাটি কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং এটি আইনের এক রূঢ় ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলের প্রতীক। আইনের ধারাগুলোও তেমনি কিম্ভূতকিমাকার— কেউ হাঁচলে তাকে 'টিকিট' নিতে হবে, কেউ শুলে তাকে 'ফাঁসি' দেওয়া হবে। এটি আসলে ফ্রাঞ্জ কাফকার 'The Trial'-এর সেই আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধার এক দেশীয় সংস্করণ, যেখানে সাধারণ মানুষ আইনের জালে বন্দি কিন্তু তার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পায় না।

সুকুমারের অনেক কবিতায় আমরা এমন সব রাজার দেখা পাই, যারা অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু চরম মাত্রায় মূর্খ ও অদ্ভুত। 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' বা 'রামগরুড়ের ছানা'-র মতো চরিত্রগুলো আসলে সমাজের সেই গম্ভীর ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রতিচ্ছবি, যারা সামান্য হাসি বা আনন্দের স্পর্শে নিজেদের গাম্ভীর্য হারানোর ভয়ে তটস্থ থাকে।

"রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে, 'ভয়াবহ হাঙ্গামা'!"[১২]

এই গাম্ভীর্য আসলে ক্ষমতার এক মুখোশ। সুকুমার দেখিয়েছেন যে, স্বৈরাচারী শাসক সবসময় হাস্যরসকে ভয় পায়, কারণ হাসি মানুষের মনে মুক্তির স্বাদ এনে দেয় এবং ক্ষমতার ভিত্তি নড়িয়ে দেয়। কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপের অন্যতম লক্ষ্য ছিল কলকাতার তথাকথিত 'শিক্ষিত' ও 'ভদ্রলোক' সমাজ। যারা নিজেদের শিকড় ভুলে সাহেব সাজতে গিয়ে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। তাঁর 'বাবু' বা 'পণ্ডিত' চরিত্রগুলো সবসময় এমন ভাষায় কথা বলে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এটি আসলে সেই 'জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য' যা উপনিবেশবাদীরা স্থানীয়দের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স' ধ্বংসাত্মক নয়, বরং তা এক প্রকার মুক্তিদায়ক। তিনি আমাদের শেখান যে, যখন চারপাশের জগত যুক্তিহীন ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তখন 'অযুক্তি' বা 'খামখেয়ালিপনাই' হতে পারে প্রতিবাদের শ্রেষ্ঠ ভাষা। তাঁর কাব্যের শেষ পঙক্তিটি তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর।"[১৩]

এই সাঙ্গ হওয়া আসলে এক নতুন চেতনার জাগরণ। সুকুমার রায় প্রমাণ করে গেছেন যে, সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ বদলানোর জন্য কেবল গম্ভীর ভাষণের প্রয়োজন নেই; বরং একটি 'খিচুড়ি' বা 'হাঁসজারু' দিয়েও বিশ্বজনীন সত্য ও রাজনীতির চরম পাঠ দেওয়া সম্ভব।

সুকুমার রায়ের সাহিত্যকে কেবল শিশুতোষ আমোদের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা বর্তমান সাহিত্য-সমালোচনার প্রেক্ষাপটে এক প্রকার তাত্ত্বিক অন্যায্যতার শামিল। অত্র গবেষণায় আমরা দেখেছি, সুকুমারের 'ননসেন্স' বা 'খেয়াল-রস' আদতে কোনো অসংলগ্ন প্রলাপ নয়, বরং তা ছিল একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহিত্যিক কৌশল। তাঁর সৃষ্ট 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপ' থেকে শুরু করে 'একুশে আইন'-এর বিচিত্র বিধিনিষেধ— সবই এক অদৃশ্য রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিবাদের সংকেত বহন করে। তিনি তাঁর রচনায় যেভাবে বাস্তবতার প্রচলিত কাঠামোকে চূর্ণ করেছেন, তা ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদের সমান্তরাল এক অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। ফরাসি পরাবাস্তববাদীরা যখন সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণমুক্তির কথা বলছিলেন, সুকুমার তখন অত্যন্ত নিভৃতে বাংলার নিজস্ব লোকায়ত দর্শন ও শহুরে মনস্তত্ত্বের মিশেলে এক 'সাংস্কৃতিক সাবভার্সন' তৈরি করেছিলেন। তাঁর অবান্তরতা বা অ্যাবসার্ডিটি আলবেয়ার কামু বা স্যামুয়েল বেকেটের নিহিলিজমের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, বরং তা এক প্রকার মুক্তির আনন্দ দেয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জীবন যখন যুক্তিহীন ও ক্ষমতার দম্ভে ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন হাসি ও অযুক্তির মাধ্যমে সেই ক্ষমতার ভিত্তি নড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। সুকুমারের সবচেয়ে বড় অবদান হলো তাঁর ভাষিক বিপ্লব। তিনি শব্দের আভিধানিক আধিপত্য ভেঙে দিয়ে ধ্বনি ও রূপকের এক নতুন ব্যাকরণ নির্মাণ করেছেন। উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বে যা 'হাইব্রিডিটি' বা 'থার্ড স্পেস' নামে পরিচিত, সুকুমারের সংকর প্রাণীকুল তারই সার্থক রূপায়ণ। ব্রিটিশ আমলের মধ্যবিত্ত বাঙালির যে আত্মপরিচয়ের সংকট, তাকে তিনি করুণা না করে বরং কৌতুকের আয়নায় প্রতিফলিত করেছেন। 'একুশে আইন'-এর মাধ্যমে তিনি যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরাচারকে বিদ্ধ করেছেন, তা আজও যেকোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোর অসংগতি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে এক সন্ধিক্ষণের শিল্পী। তাঁর সাহিত্য পাঠ করার অর্থ হলো লুই ক্যারল বা এডওয়ার্ড লিয়ারের উত্তরাধিকারকে ছাপিয়ে এক নিজস্ব 'এথনো-সাররিয়ালিজম' বা নৃ-পরাবাস্তববাদকে চেনা। বর্তমানের এই পোস্ট-ট্রুথ বা উত্তর-সত্যের যুগে, যেখানে তথ্যের আধিক্যে সত্য নিরন্তর দিশেহারা, সেখানে সুকুমারের 'ননসেন্স' আমাদের শেখায় কীভাবে অসংগতির মাঝেও সংগতি খুঁজে নিতে হয়। সুকুমার রায়ের রচনার এই বহুমুখী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বরং বিশ্ব-সাহিত্যতত্ত্বের মানচিত্রেও তাঁকে এক অনিবার্য উচ্চতায় আসীন করে। তাঁর 'আবোল তাবোল' সাঙ্গ হওয়ার যে সুরটি বেজে ওঠে, তা আসলে এক নতুন চেতনার সূচনা—যেখানে যুক্তি আর অযুক্তির কোনো সীমানা নেই, আছে কেবল অনন্ত বিস্ময় ও সৃজনশীলতার অপার স্বাধীনতা।

তথ্যসূত্র:

১। রায়, সুকুমার। একুশে আইন। আবোল তাবোল, সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ১৫।
২। রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৫৩-৫৪।
৩। রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৬৮-৬৯।
৪। রায়, সুকুমার। খিচুড়ি। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৩।
৫। রায়, সুকুমার। খিচুড়ি। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৩।
৬। রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৫৩।
৭। রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৬৮।
৮। রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৭৪।
৯। রায়, সুকুমার। ভয় পেয়ো না। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৭।
১০। রায়, সুকুমার। খুড়োর কল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ২১।
১১। রায়, সুকুমার। একুশে আইন। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ১৭-১৮।
১২। রায়, সুকুমার। রামগরুড়ের ছানা। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৪।
১৩। রায়, সুকুমার। আবল তাবোল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. রায়, সুকুমার। আবোল তাবোল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩-৪৮।
২. রায়, সুকুমার। হযবরল। সুকুমার সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫৩-৮২।
৩. বাখতিন, মিখাইল। র‍্যাবেলে অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ল্ড (Rabelais and His World)। অনুবাদ করেছেন হেলেন ইসোলস্কি, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪, পৃ. ১৯-৩০।
৪. ভাবা, হমি কে। দ্য লোকেশন অফ কালচার (The Location of Culture)। রুটলেজ, ১৯৯৪, পৃ. ১১২-১২০।
৫. ফ্রয়েড, সিগমুন্ড। দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস (The Interpretation of Dreams)। অনুবাদ করেছেন জেমস স্ট্র্যাচি, বেসিক বুকস, ২০১০, পৃ. ২৪০-২৫৫।
৬. ক্যারল, লুইস। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড (Alice in Wonderland)। ম্যাকমিলান পাবলিশার্স, ১৮৬৫ (পুনর্মুদ্রণ ২০০৫), পৃ. ৪২-৬০।
৭. সসার, ফার্দিনান্দ ডি। কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিকস (Course in General Linguistics)। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১, পৃ. ৬৬-৭৪।